প্রথম অধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও সমকাল

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি ছিল সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল পীঠস্থান। এই ঠাকুর বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছেন একে একে সব মহান ব্যক্তি। দ্বারাকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ এর মত গুণী মানুষজন। যাঁরা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নিজেদের প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। দ্বারকানাথ ও দিগম্বরী দেবীর ছিল পাঁচ সন্তান ও একটি কন্যা। দ্বারকানাথের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ। গিরিন্দ্রনাথের পুত্র গুনেন্দ্রনাথ ও স্ত্রী সৌদামিনীর তিন সন্তান ও দুই কন্যা ছিল। পুত্রগণ গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও দুই কন্যা যথাক্রমে বিনয়নীদেবী ও সুনয়নীদেবী। এই তিন ভ্রাতাই পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় তাঁদের শিল্পকলার সাধনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির ছয় নম্বর বাড়িটিই ছিল আদি বাড়ি। যেটি তৈরী হয়েছিল নীলমনি ঠাকুরের আমলে। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করার ফলে তিনি বৈঠকখানা হিসাবে ওই বাড়ির পাশেই পাঁচ নম্বর বাড়িটি তৈরী করেন। এই বাড়িতেই মাঝে মাঝে বসত তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মজলিস, খাওয়া-দাওয়া, আদর-আপ্যায়ণ। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভাইদের নিয়ে ছয় নম্বর বাড়িতেই বসবাস করতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যোগমায়াদেবী পুত্র-সন্তানদের নিয়ে পাঁচ নম্বর বাড়িতে চলে আসেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট বেলা বারোটায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ছোটোবেলা থেকেই পাশে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সাহিত্য বোদ্ধাকে। যাঁকে তিনি 'রবিকা' বলেই সম্বোধন করতেন। যাঁর কাছ থেকে তিনি লেখালেখির ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছেন কিন্তু তাঁর স্বকীয়তায় রবীন্দ্রনাথের কোন ছাপ পড়েনি। অবনীন্দ্রনাথ ও সুহাসিনীদেবীর ছিল তিন সন্তান ও চার কন্যা। সন্তান অলকেন্দ্রনাথ, তরুণেন্দ্রনাথ, মানীন্দ্রনাথ ও কন্যা উমাদেবী, করুণাদেবী, শোভা ও সুরূপাদেবী। এর মধ্যে শোভা বাল্যকালেই মারা যান। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও অবনীন্দ্রনাথের পিতামহেরা এই ধর্ম গ্রহণ করেন নি। তাঁরা হিন্দুই ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মারা গেলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেন। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ হিন্দু মতেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যোগমায়াদেবী যখন পুত্র-সন্তানদের নিয়ে পাঁচ নম্বর ঠাকুর বাড়িতে চলে এসেছিলেন তখন তাঁর নিজ চেষ্টায় তিনি গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে বাড়িতে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। চিত্রাদেব তাঁর 'ঠাকুর বাড়ির

বাহিরমহল' বইতে জানাচ্ছেন একথা — "দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ (১৮৫৪) ও নগেন্দ্রনাথের (১৮৫৮) মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হন। সম্ভবত এই সময়ে তাঁর বাড়িতে যাবতীয় পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়, গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন পাশের বাড়ি অর্থাৎ গিরীন্দ্রনাথের গৃহে অধিষ্ঠিত হন তাঁর বিধবা পত্নী যোগমায়ার চেষ্টায়। একটি বাড়ি এসময় থেকে দুটি বাড়িতে পরিণত হয়, এ ব্যবস্থা অবশ্য দ্বারকানাথের, তিনিই গিরীন্দ্রনাথকে বৈঠকখানা বাড়িটি দিয়েছিলেন।"[১]

গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথও হিন্দুধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের ৫নং বাড়িতে গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পুজো হত। তাঁরা বৈষ্ণব মতে পূজা অর্চনা করতেন। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দু ধর্মের সাথে সাথে অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরিন্দ্রনাথ এই দুই পরিবারে ধর্মের দুই ভিন্নমত সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কখনোই সম্পর্কে ফাটল ধরে নি। সর্বক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। নিম্নে একটি তালিকার মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের পারিবারিক চিত্র তুলে ধরব।

<u>বংশলতা</u>

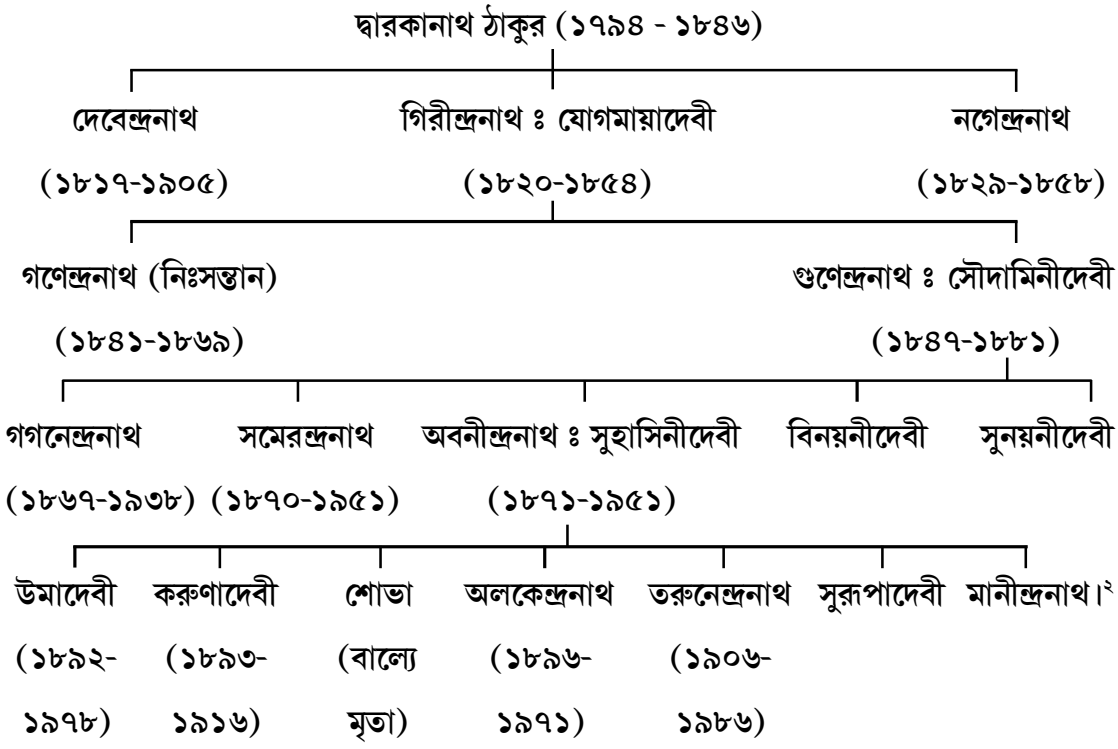

অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন গুণী শিল্পী। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে শখ ছিল। পাখী পোষা, বাগান করা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা এই নিয়েই কাটত তাঁর দিন। তিনি ছিলেন খুব শৌখিন মানুষ। নিজের হাতে তিনি বাগানের দেখভাল করতেন। গাছের যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বিভিন্ন বই আনিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। আর ছিল নানান রকম পাখি পোষার শখ। বাবার এই

খেয়ালি সত্তাটা যেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বাড়িতে সন্ধ্যায় মেয়েদের দল রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কাহিনী নিয়ে পাঠ করতে বসে যেত। দিনের বেলায় বাড়িতে হাজার রকম মানুষের ভিড়। মেয়েরা কুটত তরকারি, দাসীরা কুটত মাছ, ধোপা এসে নিয়ে যেত কাপড়, ছেলেরা বাইরে বেড়িয়ে এসে ঘরে ফিরলেই অন্দরের দরজায় পড়ত খিল। এই সুন্দর আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের বড় হয়ে ওঠা।

ঠাকুর বাড়ির অন্যসব ছেলেদের মতোই অবনীন্দ্রনাথও দাসী ও চাকরের হাতে মানুষ হতে লাগল। ছেলেবেলাকার দাসীর নাম পদ্মদাসী। এর কোলেই অবনীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা। রাত্রে তাকে দুধ খাইয়ে মশারির ভিতর ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে দাসীরা গল্প করতে বসত। কিন্তু ঘুম আসতনা অবনীন্দ্রনাথের। তিনি শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতেন তাদের কথাবার্তার শব্দ। আর যখনই তিনি শব্দ করতেন তখনই দাসী এসে তাঁর মুখে নাড়কেল গুড় দিয়ে আবার গল্পের আসরে বসতো সে। সেই কথা তিনি বলেছেন স্মৃতিকথাতে — ''তখন ঐ একটা শব্দ ছিল, দাসীদের কথাবার্তার - গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্। বেশ একুট স্পষ্ট স্পষ্ট কানে আসত। ঘুমই হত না। মাঝে মাঝে আমি কুঁই কুঁই করে উঠি, পদ্মদাসী ছুটে এসে মশারি তুলে মুখে একটা গুড়-নারকেলের নাড়ু, সেই একটি মুখে গুঁজে দেয় ঃ বলে, 'ঘুমো'। নারকেল নাড়ুটি চুষতে থাকি। পদ্মদাসী গুণ্ গুণ্ করে ছড়া কাটে আর পিঠ চাপড়ায়, এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি।''[৩]

তারপর আর একটু বড়ো হতেই তিনি চলে গেলেন রামলাল চাকরের হাতে। রামলাল চাকরের কাছ থেকে ভূতের গল্প, রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে অবনীন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠতে লাগলেন। অবনীন্দ্রনাথের বয়স যখন তিন পেরিয়ে চার পড়ল তখন তাঁর হাতে খড়ি দেবার ব্যবস্থা হল। রামলাল চাকর তাঁকে নিয়ে চলল নানা গলি, সিঁড়ি, উঠোন পেরিয়ে ঠাকুর ঘরের দরজার কাছে। তারপর বললেন সেই ঘরে প্রবেশ করতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন — ''রামলাল ফস্ করে চটি জুতো পা থেকে খুলে নিয়ে বললে - 'যাও'। ঠাকুর ঘরের দেওয়ালে সাদা পঙ্খের প্রলেপ; খাটালে খাটালে ছোটো সারি সারি কুলঙ্গি; তারই একটাতে তেল-কালি পড়া পিলসুজে পিদুম জ্বলছে সকালবেলায়। ঠিক তারই নীচে দেওয়ালের গায়ে, প্রায় মুছে গেছে এমন একটা বসুধারার ছোপ। ঘরের মেঝের একটা সাদা চুন মাখানো দেলকো, আর আমপাতা, ডাব আর সিঁদুর মাখানো একটা ঘট। পুজোর সামগ্রী নিয়ে তারই কাছে পুরুত বসে। আর গায়ে নামাবলি জড়িয়ে হরিনামের মালা হাতে ছোটোপিসিমা। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ার গন্ধে ভরা ঘরের মধ্যেটায় কী আছে দেখার আগেই আমার চোখ জ্বালা করতে থাকল। তারপর কে যে সে মনে নেই, মেঝেতে একটা বড়ো 'ক' লিখে দিলে। রাম খড়ি হাতের মুঠোয় ধরে দাগা বুলোলেন — একবার, দু-বার, তিনবার। তারপরেই শাঁখ বাজল, হাতে খড়িও হয়ে গেল।''[৪]

এরপর তিনি ভর্তি হলেন বাড়ির কাছে নর্মাল স্কুলে। স্কুলে যাবার ইচ্ছে তাঁর একেবারেই ছিল

না। চাকর-বাকররা তাঁকে জোর করে স্কুলের ভ্যানে তুলে দিতেন। আবার কোনো কোনো দিন যখন প্রচুর কান্নাকাটি করতেন তখন ছোটোপিসিমার কথায় তিনি ছাড় পেতেন। তিনি ছিলেন স্বাভাব খেয়ালী মনের মানুষ। বদ্ধ ঘরে তার ভালো লাগবে কী করে। স্কুল ভালো লাগতো না ঠিকই কিন্তু স্কুলের ঘরের মধ্যেই এক কাচের আলমারিতে জাহাজ ও শঙ্খ দেখেই তার সময় কাটত। আর ছবির প্রতি ভালোবাসা তখন থেকেই তৈরী হতে শুরু করল তাঁর। তাঁর ক্লাসের সঙ্গী ভুলুর সাহায্য নিয়ে তিনি প্রথম একটি মাটির কুঁজো, আর একটি মাটির গ্লাস এঁকে ফেললেন। তারপর এক এক করে লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, মাধব পণ্ডিত, হরনাথ পণ্ডিতের কাছে তিনটে শ্রেণী পার হয়ে ইংরেজী মাস্টারমশায়ের ক্লাসে পাঠ শুরু করলেন। আর এখানেই ঘটে গেল এক ঘটনা। মাস্টারমশায় ক্লাসে পড়ান P-u-d-d-i-n-g - পাডিং। আর অবনীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন ওটা হবে পুডিং। এই নিয়ে চলল বিরোধ। শেষে পিঠে বেতের ঘা খেয়ে এক ঘন্টা শাস্তি ভোগ করে তিনি বাড়ি ফিরলেন। তাঁর কথায় — ''ক্লাসে ইংরেজির মাস্টার আমাদের পড়ালেন P-u-d-d-i-n-g - পাডিং। আমাদের মাথায় কী বুদ্ধি খেলে গেল, বলে উঠলুম 'মাস্টারমশায়, এর উচ্চারণ তো পাডিং হবে না, পুডিং, আমি যে বাড়িতে এ জিনিস রোজ খাই।' মাস্টার ধমকে উঠলেন, 'বল পাডিং'। আমি বলি, 'না পুডিং'। তিন যত বলতে বলেন পাডিং, আমি আমার বুলি ছাড়িনে। ... বাকি ছেলেরা থ হয়ে বসে দেখে কী হয় কাণ্ড। এই করতে করতে ক্লাসের ঘন্টা শেষ হল। শাস্তি দিলেন চারটের পর এক ঘন্টা 'কনফাইন'।' ... মাস্টার নিজের বৈকালিক সেরে এলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এবারে বল্ পাডিং'। উত্তর দিলেম, 'পুডিং'। যেমন শোনা, টানাপাখার দড়ি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে 'তবে রে ব্যাদড়া ছেলে, বলবি নে? বলতেই হবে তোকে পাডিং। দেখি কেমন না বলিস।' বলে সপাসপ জোড়া বেত লাগালেন পিঠে। বেতের ঘায়ে পিঠ হাত লাল হয়ে গেল — তখনো বলছি পুডিং। যা হোক, বাড়ি এলাম। ছোটোপিসিমা বললেন, 'কী ব্যাপার?' রামলাল বললে, 'আমার বাবু আজ বড্ড মার খেয়েছেন।' আমিও জামা খুলে পিঠ দেখালুম, হাত দেখালুম। দড়ির দাগ বসে গিয়েছিল হাতে। বাবামশয়া তৎক্ষণাৎ, নর্মাল স্কুল থেকে নাম কাটাবার হুকুম দিলেন; বললেন, 'কাল থেকে ছেলেরা বাড়িতে পড়বে।' চুকে গেল ইস্কুল যাবার ভয়; জোড়াবেত খেয়ে ছাড়া পেলুম। এক 'পাডিং' এই ইংরেজি বিদ্যে শেষ। পরদিন থেকে বাড়িতে বাবামশায়ের মাস্টার যদু ঘোষাল আমায় পড়াবার ভার নিলেন।''[৫]

চুকে গেল তাঁর স্কুলের পাঠ। মনে মনে তিনিও তো এটাই চেয়েছিলেন। স্কুলের পাঠ চুকলে কি হবে বাড়িতে তাঁর সময় আর কাটতে চায় না। সকালে পড়াশুনো করে সময় কেটে যায়, কিন্তু দীর্ঘ দুপুর আর কাটতে চায় না তাঁর। বাড়ির ভিতরে বোনেদের সাথে খেলতে গেলে তাড়া খান। বাইরেও নেই কেউ খেলার সাথী। তাঁর বাবার পোষা কাকাতুয়া, কুকুর কামিনী, পোষা বাঁদর, শখের হরিণ

এদের সাথে ভাব জমাতে গেলেও তারা তাঁকে সাথ দেয় না। শেষে গোটা জোড়াসাঁকোর বাড়ির সাথেই তিনি ভাব জমালেন। একা একা ঘুরতে লাগলেন বাড়ির সর্বত্র। কখনো কখনো দাদাদের ডেস্কের ভিতর কী আছে দেখে ভয়ে ভয়ে রেখে দিতেন, বাবার টেবিলের উপর সাজানো নানা রঙের জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কখনো বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে শুয়ে থাকতে থাকতে মাকড়সার ফাঁদ দেখে বেড়ান। এইভাবে একা থাকতে থাকতে তাঁর দেখার চোখ খুলে গেল, ভাবতে শিখলেন, কান নানান শব্দ ধরতে শিখল। তিনি বলেন — ''তবে একলা থাকার গুণ আছে একটা। দেখতে শুনতে শেখা যায়। ওই ওমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে লাগল। তখন থেকেই কত কী বস্তু, কত কী শব্দ যেন মন-হরিণের কাছে এসে পৌঁছতে লেগেছে। মানুষ পশু-পাখি সঙ্গী পেলেম না কাউকেই। ওই অত বড় বাড়িটাই তখন আমার সঙ্গী হয়ে উঠল; নতুন রূপ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিতে লাগল।''[৬]

বাড়িতে বসত গানের আসর। তাঁর বাবারও গানের খুব শখ ছিল। কীর্তন, বৈঠকি, ওস্তাদি গান সব ধরনেরই গানের আসর বসত বাড়িতে। আর তার সব চেয়ে স্নেহের আশ্রয়স্থল ছিল তাঁর ছোটোপিসিমা। তাঁর ঘরে নানা ধরনের ছবি টাঙানো থাকত। ''কত রকমের ছবি! দেশি ধরনের অয়েল পেন্টিং, শ্রীকৃষ্ণের পায়েস ভক্ষণ, ... শকুন্তলার ছবি — তিনটি মেয়ে বনের ভিতর দিয়ে চলেছে, শকুন্তলা বলে বুঝতুম না, তবে ভালো লাগত দেখতে; মদনভস্মের ছবি — ... সরোজিনী নাটকের ছবি; কাদম্বরীর ছবি - রাজপুত্তর পুকুর ধারে গাছতলায় ঘোড়া বেঁধে শিব মন্দিরের দাওয়ায় বসে আছে।''[৭]

এভাবেই তাঁর ছবি দেখার স্বাদ মিটত ছোটোপিসিমার ঘরে। দুরন্তপনা, খামখেয়ালিপনার তাঁর শেষ ছিল না। কখনো সে মাছ ভর্তি জলের গামলায় লাল রঙ গুলে দেয়, মাছ মরে যায়; কখনো আবার মিস্ত্রিদের বাটালি দিয়ে কাঠে ঘা মারতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে; খখনো পাখির খাঁচা খুলে দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়। আসলে সব সময় জানার ইচ্ছা তাকে তাড়িয়ে বেড়াত।

তাঁর বাবার গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে কোন্নগরে একটি বাগান বাড়ি ছিল। গ্রীষ্মকালে তাঁরা সেখানে সপরিবারে বেড়াতে যেতেন। সেই প্রথম তাঁর বাড়ির বাইরে পা রাখা। ফিটন গাড়ি চড়ে যখন তাঁরা জোড়াসাঁকো ছেড়ে শিবমন্দির পেরিয়ে গেল তখন পথের নানা দৃশ্য দেখে অবনের চোখ জুড়িয়ে গেল। কখনো তিনি গাছগুলোকে মাকড়সার জালের মত অস্পষ্ট দেখছেন, কখনো তাঁর নাকে এসে লাগছে পোড়া মাটির গন্ধ। তাঁদের বাড়ির ওপর পারেই ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পেনেটির বাগানবাড়ি। বন্দুকের আওয়াজ দিয়ে একে অপরকে তারা সাড়া দিতেন। একবার অবনের সাহস

বাড়াবার জন্য তাঁর কাঁধে বন্দুক রেখে তাঁর বাবা গুলি ছুঁড়েছিলেন।

খুব আনন্দেই কাটছিল তাঁর এই কোন্নগরের জীবন। ফুলগাছ থেকে রেশমের গুটি সংগ্রহ করে প্রজাপতির পায়ে সুতো পরিয়ে ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দিয়ে, কখনো গঙ্গার রূপ দেখে, নৌকার চলাচল, আকাশে কালো মেঘের খেলা দেখতে দেখতে তার ছবির মত সময় কেটে যেত। দিনের বেলার দেখা সব কিছু রাত্রে তাঁর চোখে কল্পনায় ধরা দিত। দিনের বেলায় চাটুজ্জেমশায় যে তাঁকে বলেছিলেন রাত্রে কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির বিয়ে হবে — সেই ছবিও তাঁর চোখে ভেসে উঠত। তাঁর কথায় — ''জ্যোৎস্নারাত্রির, চাঁদের আলোয় কাঁঠালতলায় ছায়া পড়েছে ঘন অন্ধকার। ... রাত জেগে দেখছি চেয়ে, কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোর মশাল জ্বালিয়ে এল তাদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হৈ-চৈ, বাদ্যভাণ্ড, দৌড়াদৌড়ি, হুলুস্থুলু ব্যাপার। সব দেখছি কল্পনায়। কাঁঠালতলায় যে জোনাকি পোকা জ্বলছে তা তখন জ্ঞান নেই।''[৮]

এমনই কল্পনা প্রবণ মন ছিল তাঁর। যাকে তিনি সারাজীবন লালন করে গেছেন। তবে এ আনন্দ তাঁর বেশিদিন স্থায়ী হল না। তার একটি ছোটোভাই ছিল। তার বাবা তাঁকে আদর করে 'র‍্যাট' বলে ডাকতেন। সে মারা গেলে তাঁর বাবার মন একেবারে ভেঙে যায়। তারপর তাঁর বাবা জোড়াসাঁকো ছেড়ে সদ্য কেনা পলতার বাগান বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেই বাগান বাড়িতে এসে অবনের ঠাকুমার মন ভরল না। তখন তাঁর বাবা সেই বাগানকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তুললেন। ফোয়ারা বসালনে, ফটক বসল, নানা রকম গাছ, নানা জাতের পাখি আনা হল। এখানেই তাঁর বোন বিনয়নীর বিয়ের ঠিকঠাক হয়। তারপর তাঁর বাবা সেই উপলক্ষে বড়ো পার্টি দিলেন। আনন্দ-হইহুল্লোড় হল। কিছুদিন পর গুণেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এল, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের বাবা তাদেরকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেলেন। সেদিনকার কথা তিনি স্মৃতিকথায় ধরে দিয়েছেন — ''এমন সময় খবর হল বাবামশায়ের অসুখ। এত হৈ-চৈ হতে হতে কেমন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া পড়ল সবার মুখে-চোখে-চলায়-বলায়। ... দাসদাসীরা গুজ্‌গুজ্‌ ফিস্‌ফিস্‌ করছে এখানে ওখানে। জ্যৈষ্ঠ মাস, ঝড়ের মেঘ উঠল কালো হয়ে, শোঁ - শোঁ বাতাস বইল। ভোরের বেলা দাসীরা আমাদের ঠেলে তুলে দিলে, 'যা শেষ দেখা দেখে আয়।' নিয়ে গেল আমাদের বাবামশায়ের ঘরে। বিছানায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করছেন। পাশ থেকে কে একজন বললেন, 'ছেলেদের দেখতে চেয়েছিলে। ছেলেরা এসেছে দেখো।' শুনে বাবামশায় ঘাড় একটু তুলে একবার তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মাথা কাত হয়ে পড়ল বালিশে। বড়োপিসিমা, ছোটোপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি একি হল। কাল জ্যৈষ্ঠ এলরে, কাল জ্যৈষ্ঠ।' সেই দিন থেকে ছোটোবেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল।''[৯]

বাবা মারা যাওয়ার পর ভেঙে পড়া সংসারের হাল ধরলেন তাঁর মা সৌদামিনী দেবী। অবনীন্দ্রনাথের দুই পিসেমশাই সহায়তা করলেন তাদের সংসারের যাবতীয় কাজে। পুনরায় আবার অবনের পড়াশুনা আরম্ভ হল। তাকে ভর্তি করা হল সংস্কৃত কলেজে। ১৮৮১-১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ মোট নয় বছর কাটল এই কলেজে। এখান থেকে বেরিয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঊনিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মীয় ভূজগেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুহাসিনীর সঙ্গে। বিয়ের পর পরই জীবনে তিনি অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। সাজ-পোশাক বদলে গলে, চাকররা 'বাবু' বলে ডাকতে শুরু করল। সে এক নূতন অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন সে কথা তাঁর স্মৃতিকথায় — ''একদিন বিয়ে হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধরণ-ধারণ, ওঠা-বসা, সাজ-গোজ সব বদলে গেল। এখন উলটো জামা পড়ে ধুলো পায়ে ছুটোছুটি করবার দিন চলে গেছে। চাকরবাকররা 'ছোটোবাবুমশায়' বলে ডাকে, দারোয়ানরা 'ছোটো হুজুর' বলে সেলাম করে। দু'বেলা কাপড় ছাড়া অভ্যাস করতে হল, শিমলের কোঁছানো ধুতি পড়ে ফিট্‌ফাট হয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতে হল, একটু-আধটু আতর ল্যাভেণ্ডার গোলাপও মাখতে হল, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতে হল, গুড়গুড়ি টানতে হল, ড্রেসসুট বুট এঁটে থিয়েটার যেতে হল, ডিনার খেতে হল এক কথায় আমাদের বাড়ির ছোটোবাবু সাজতে হল।''[১০]

বিয়ের পর পরই তাঁর পড়াশুনোর পাঠ চুকলো না। আবার তিনি ভর্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এখানে একবছর মতো তিনি ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেন। এরই পাশাপাশি বাড়িতে চলল সংস্কৃত ভাষা নিয়ে চর্চা। তবে বেশিদিন কলেজের পাঠ চলল না। এক বছর পরেই তার প্রথাগত পড়াশুনোর জীবনে ছেদ পড়ল। আসলে তাঁর পিতাও বুঝতে পেরেছিলেন এই ছেলেটির প্রথাগত ভাবে পড়াশুনোর দিকে ঝোঁক একেবারেই নেই। তাই পলতার বাগানে কথা প্রসঙ্গে তাঁর অপর দুই সন্তান গগনেন্দ্র ও সমরেন্দ্রকে বিলেতে পাঠাবেন বলে স্থির করলেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই থাকবে এমন ঈঙ্গিত দেন। অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় লিখেছেন — ''বাবামশায় বললেন, 'মেজদা আছেন বিলেতে, গগন বিলেতে যাক। সতীশ আছে জার্মানীতে, সমর সেখানে যাবে।' আমাকে দেখিয়ে বড়োপিসিমাকে বললেন, 'ও থাকুক এখানেই। আমার সঙ্গে ঘুরবে, ইণ্ডিয়া দেখবে, জানবে।' তখন থেকেই সকলে আমার বিদ্যে-বুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, ও-সব আমার হবে না।''[১১]

সত্যিই তিনি সারা জীবন ছিলেন অত্যন্ত ঘরকুনো। বিদেশে তো যেতে চাইতেন না, এমনকি ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন স্থানে তিনি খুব বেশি ঘুরে বেড়ান নি। দক্ষিণের বারান্দায় বসে তিনি চালিয়ে গেছেন তাঁর শিল্পের সাধানা। তাঁর মধ্যে ছিল শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহও আমরা দেখতে পাই। ইচ্ছে গেল এসরাজ বাজানো শিখবেন, শেখা শুরু করলেন ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরীর কাছে। অনেক দিনের চেষ্টায় তিনি এই বাজনা বাজানোয় পাকা হয়ে ওঠেন। তাঁদের বাড়িতে

ছিল গান-বাজনার পরিবেশ। তাই তাঁর ইচ্ছে হল গান শিখবেন। গানের চর্চা শুরু করলেন রাধিকা গোঁসাই এর কাছে। তবে এ ইচ্ছেও বেশিদিন স্থায়ী হল না। আসলে তাঁর হৃদয় এখানে আসল জিনিসটি খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই তাঁর মন নানা দিকে ছুটে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধতেন, আর অবনীন্দ্রনাথ সুর তুলতেন এসরাজে। তবে সুর তুলে তা ঠিকঠাক মনে রাখতে পারতেন না অবনীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথের করা এক সুর তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে খাটতে হয়েছিল সুর তৈরী করতে।

শুধু সংগীত চর্চা না, বাড়িতে নাটকের চর্চাও জোর কদমে চলত। মাঝে মাঝে হত নাটকের অভিনয়। কারা ছিল তাঁর পাশে — রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো গুণি মানুষজন। ছোটোবেলাতে তাদের বাড়িতে যেসব নাটক অভিনীত হত সেগুলো দেখতে দেখতে তিনি বড়ো হয়ে উঠছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে নাটক ও তার অভিনয় সম্পর্কে একটা ধারনা তৈরী হয়েই ছিল। উৎসাহদাতা হিসাবে পেলেন রবীন্দ্রনাথকে। তখন আর তাঁকে আটকায়কে। রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় জোড়াসাঁকোতে গড়ে তুললেন ড্রামাট্রিক ক্লাব। সেখানে অভিনীত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক 'অলীকবাবু'। অবনীন্দ্রনাথ অভিনয়ে খুব দক্ষ ছিলেন। তার সার্টিফিকেট তিনি অনেকবার রবিকার কাছ থেকেও পেয়েছিলেন। এই 'অলীকবাবু' নাটকে তিনি ব্রজদুর্লভ এর চরিত্রে অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন অলীকবাবুর পার্ট। এই নাটকে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাজা ও রাণী' নাটকে তিনি একাই ছটা পার্ট করেছিলেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনকড়ি চরিত্রে, 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় ডাকাত, 'ফাল্গুনী'তে শ্রুতিভূষণ, 'ডাকঘর' নাটকে মোড়লের ভুমিকায় অভিনয় করেন।

তিনি বলেছেন — ''ডাকঘরে আমি হয়েছিলুম মোড়ল। ও-রকম মোড়ল আর কেউ সাজতে পারে নি। তখন মোড়ল সেজেছিলুম, সেই মোড়লি করেই চলেছি এখনো।''[১২]

তখন দেশে লেগেছিল স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ। অবনীন্দ্রনাথও তাতে যোগ দিলেন। পাশে পেলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁরা জুতোর দোকান খুললেন। দোকানের নাম দিলেন 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। ঠিক হল সেখানে শুধু স্বদেশী জিনিস বিক্রি হবে। সবার মধ্যে সেই সময় যেন দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে এই ভাব জেগেছিল। তাতে সামিলও হয়েছিল নানান স্তরের মানুষ। তিনি বলেছেন — ''শুধু কি দোকান — জায়গায় জাগয়গা পল্লী সমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবা সমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারিদিক থেকে একটা সেল্‌ফ স্যাক্‌রিফাইসেরও একটা আত্মীয়তাতর ভাব এসেছিল সবার মনে।''[১৩]

স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় শুধু নয় তাঁরা একবার বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করেছিলেন। নাটোর এ প্রোভিন্সিয়াল কনফারেন্স ইংরেজি ভাষায় হত। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁরা সেবার ঠিখ করলেন ইংরেজি নয়, কনফারেন্স হবে বাংলায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন হবে ইংরেজীতে। অবনীন্দ্রনাথরাও ছাড়বার পাত্র নন। যখনই ইংরেজিতে বক্তৃতা কেউ শুরু করে, তখন তারা বাংলা, বাংলা বলে চেঁচাতে শুরু করে। এই করে তাদের বক্তৃতা আর দেওয়া হয় না। শেষে বাংলাতেই বক্তৃতা দেওয়া হয়। স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন — ''লালমোহন ঘোষ এমন ঘোরতর সাহেব, তিনি ইংরেজি ছাড়া কখনো বলতেন না বাংলাতে, বাংলা কইবেন এ কেউ বিশ্বাস করতে পারত না — তিনিও শেষে বাংলাতেই উঠে বক্তৃতা করলেন। ... যাক, আমাদের তো জয়-জয়কার। বাংলা ভাষায় প্রচলন হল কনফারেন্স। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।''[১৪]

এই সময়কালেই তিনি আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ভারতমাতার ছবিখানি। রবীন্দ্রনাথ একবার ঠিক করলেন রাখী-বন্ধন উৎসব করবেন। সবাই মিলে উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেলেন কাজ করতে। ঠিক হল পায়ে হেঁটে গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরানো হবে। জগন্নাথ ঘাটে স্নান করে একে-অপরের হাতে রাখী পরানো চলল। হিন্দ-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের হাতে, কেউ বাদ গেলেন না। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করলেন উৎসব উপলক্ষ্যে।

অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলছেন — ''রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে — মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম — যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল —

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল —
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ... স্নান সারা হল - যারা কাছাকাছি ছিল, তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলে-মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার।''[১৫]

ড্রামাটিক ক্লাব উঠে যাওয়ার পর তাঁরা তৈরি করলেন খামখেয়ালি সভা। ঠিক হল কিছুজন সদস্য নিয়ে এটি গঠিত হবে। আর প্রতি সভ্যের বাড়িতে মাসে একবার করে মজলিস বসবে। অবনীন্দ্রনাথ এই সভায় 'দেবীপ্রতিমা' নামে একটি গল্প পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। ঠিক

হল খামখেয়ালি সভায় এটি অভিনীত হবে। তিনি তিনকড়ির চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথের সাথে পাল্লা দিয়ে। গিরিশ ঘোষ অভিনয় দেখে তাদের খুব প্রশংসা করেছিলেন। সে কথা আছে স্মৃতিকথায় — ''আমাদের সেই অভিনয় দেখে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, এ-রকম অ্যাকটার সব যদি আমার হাতে পেতুম তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম।''[১৬]

গিরিশ ঘোষ চাইলেও অবনীন্দ্রনাথ অভিনয়ে নিজেকে সঁপে দেননি। তিনি সারা জীবন করে গেছেন শিল্পের সাধনা। তাঁর কাছে শিল্প একাট শখ — ''দেখো, শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে — যাই বলো।''[১৭]

তবে তিনি মূলত ডুব দিয়েছিলেন ছবি লেখায় ও গল্প বলায়। দিন যত গড়িয়েছে তাঁর তুলি ও কলম থেকে এই দুই সৃষ্টি প্রকাশ লাভ করেছে।

ছোটোবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল সব কিছুকে ভাল করে দেখবার, জানবার ইচ্ছে। তিনি যখনই কিছু কাছে পেয়েছেন তার শেষ রস অবধি নিঃশেষ করে নিয়েছেন। ধরে রেখেছেন মনের গভীর। ছোটোবেলা থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর দেখা ও সংগ্রহ করার ঝোঁক ছিল। স্মৃতিকথায় পাই সে কথা — ''আটিস্ট হচ্ছে কলেক্টর, সে এটা ওটা থেকে সংগ্রহ করে সারাক্ষণ, সংগ্রহই তার আনন্দ। রবিকা বলতেন, 'যখন আমি চুপ করে বসে থাকি তখন বেশি কাজ করি।' তার মানে তখন সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। চেয়ে আছি, ওই সবুজ রঙের মেহেদি বেড়ার উপরে রোদ পড়েছে। মন সংগ্রহ করে রাখল, একদিন হয়তো কোনো কিছুতে ফুটে বের হবে। এই কাঠের টুকরোটি যেতে যেতে পথে পেলুম, তুলে পকেটে পুরলুম। বললে তো ঝুড়ি ঝুড়ি কাঠের টুকরো এনে দিতে পারে রথী ভাই এখ্খুনি। কিন্তু তাতে সংগ্রহের আনন্দ থাকে না। এমনি কত কিছু সংগ্রহ হয় আর্টিস্টের মনে ভাণ্ডারেও। এই সংগ্রহের বাতিক আমার চিরকালের।''[১৮]

শৈশব থেকে পেয়েছেন ছবি দেখতে। দু-চোখ ভরে দেখেছেন সব। বাবা গুণেন্দ্রনাথ ভালো ছবি আঁকতেন। তিনি ছবি আঁকা শেখার জন্য গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তিও হয়েছিলেন। শখ ছিল বাগান করার। তাঁর বাগানে থাকত নানান শৌখিন গাছ, বিভিন্ন রকমের ফুল, পাখি। অবনীন্দ্রনাথ সেইসব দেখে বেড়াতেন অর্থাৎ সংগ্রহ করে চলতেন। এদিকে বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আঁকা শিখছেন। অবনীন্দ্রনাথ সেগুলো দূর থেকে দেখেন কিন্তু কাছে ঘেঁষতে পারেন না। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার অভ্যাস শুরু হয়ে যায়। নর্মাল স্কুলে পড়ার সময় তিনি সহপাঠি ভুলুর কাছ থেকে কুঁজো গেলাস আঁকা শিখে নিয়েছিলেন। কোন্নগরের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে কুঁড়েঘর দেখে

তিনিও কুঁড়েঘর আঁকা শুরু করেন। পিসিমার বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ছবি দেখে বেড়ান। আসলে আঁকবার ইচ্ছে তাঁর সেই ছোটোবেলা থেকেই আপন মনে জাগ্রত ছিল। বড়ো হয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থকে চিত্রায়িত করেন। সেগুলি ছাপা হল 'সাধনা' কাগজে। চোখে পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে ডেকে পুরোপুরি ছবি আঁকাতে মনোনিবেশ করতে বললেন। এক বন্ধু মারফৎ তিনি অবনকে পাঠিয়ে দিলেন আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ইতালিয়ান আর্টিস্ট ওলিন্তো গিলার্ডির কাছে। ১৮৯২ সালে তিনি গিলার্ডির কাছে ছবি আঁক শুরু করেন। মাসে তিন-চারবার তাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে শিখলেন প্যাস্টেল-ড্রইং আর অয়েল পেন্টিং। পোট্রেট আঁকতেও হাত পাকালেন। এভাবে চলল ছয় মাস, গিলার্ডি বুঝতে পারলেন তার আর দেওয়ার কিছু নেই। অবনীন্দ্রনাথও যেন একথা বুঝতে পেরেছিলেন। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় পাই সে কথা —

''গিলার্ডি সাহেবেরে কাছে বেশ কিছুদিন শিক্ষা পাবার পর একদিন সাহেব বললেন — আমার যা কিছু দেবার সব তোমায় দিয়েছি। তোমার আর কিছু শেখবার নেই। আমার সব বিদ্যা তুমি কেড়ে নিয়েছ। অবনীন্দ্রনাথ বললেন — সে কি সাহেব? এরই মধ্যে শিক্ষা শেষ হলে চলবে কি করে? আমি যে রেম্‌ব্রান্ট, টিশিয়ান কিংবা দ্যা-ভিঞ্চির মতো বড় আর্টিস্ট হতে চাই। সাহেব উত্তর দিলেন — বেশ, তুমি এবার নিজের বাড়িতে বসে নিজের স্টুডিওতে ছবি আঁকো, ওতেই হবে।''[১৯]

বাড়িতে খুলে বসলেন স্টুডিও। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'চিত্রাঙ্গদা'। অবনীন্দ্রনাথ তার ছবিগুলি আঁকলেন। বয়সে তিনি বলেছিলেন এই ছবিগুলি দেখলে তাঁর হাসি পেত। আসলে তখনো তিনি ছবিতে এতো পাকা হয়ে ওঠেন নি। তবু তিনি বলেন — ''কিন্তু এই হল রবিকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা-কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।''[২০]

সেই সময় তিনি পোর্ট্রেট আঁকায় হাত পাকিয়ে ছিলেন। যেই স্টুডিওতে আসত তার পোট্রেট তিনি এঁকে ফেলতেন। শিল্পীমন যেন প্রকাশের অপেক্ষায় থাকত। অলোকেন্দ্রনাথ তার একটি হিসেব দিয়েছেন — ''এগুলি হচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইখানি পোর্ট্রেট, রবীন্দ্রনাথের ছবি একখানি — যেটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংগ্রহে আছে। রামলাল চাকরের একখানি, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের; নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং পুত্র অলোকেন্দ্রনাথের একখানি করে পোর্ট্রেট। শেষোক্ত ছবিখানি প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে পাঠানো হয় এবং তার জন্য

বাবা একটি পদক প্রাপ্ত হন।''[২১]

কেরলের বিখ্যাত শিল্পী রবিবর্মা একবার এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথের কাজ দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। স্মৃতিকথায় পায় — ''তিনি আমার স্টুডিয়োতে আমার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছবির দিকে এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।''[২২]

তাঁর ভবিষ্যৎবাণী যে ভুল ছিল না, তা আমরা পরবর্তী সময়ে বুঝতে পারি। কেননা অবনীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার পুরোধা পুরুষ। এই রবিবর্মাকে নিয়ে পরে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

তারপর তিনি খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পী সি. এল. পামরের কাছে অয়েল পেন্টিং শিক্ষার পাঠ নেন। বাড়িতে মডেল আসে, তাদেরকে দেখে তিনি আঁকেন। কিছুদিন আঁকার পর পামর তাঁকে বলেন তেল রং-এ আঁকা তিনি রপ্ত করে ফেলেছেন। এরপর তাঁকে অ্যানাটমি স্টাডি করতে বলেন। সেইমত তিনি একটি মড়ার মাথা আঁকতে গিয়ে জ্ঞান হারান এবং বাড়ি ফিরে এসে তাঁর ১০৬ ডিগ্রি জ্বর হয়ে যায়। মায়ের বকুনিতে তিনি কিছুদিন ছবি আঁকা বন্ধ রাখেন। কিন্তু শিল্পীর মন বাধা মানে না। আবার পামর এর কাছেই জল রং এর শিক্ষা নিতে লাগলেন। কিন্তু মন তার ঠিক ভরছে না ছবি এঁকে। সবই যেন বিদেশী টেকনিকে এঁকে চলা। দেশি বিষয় ও দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকবার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। কিন্তু সঠিক পথ তখনও খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

এমন সময় ঘটল এক ঘটনা। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছোটো দাদামশায়। তাঁর এক পুরনো মেমসাহেব বন্ধু মিসেস মার্টিন ডেল অবনীন্দ্রনাথকে দশ-বারোখানা ছবি পাঠান। আবার সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে পাঠালেন একখানা দিল্লীর পার্শিয়ান ছবির বই। আবার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেলেন রবি বর্মার আঁকা কতকগুলো ফটো। সবকিছু দেখে অবনীন্দ্রনাথের চোখ খুলে গেল। শুরু করে দিলেন দেশীয় ভাব ও রীতিতে ছবি আঁকতে। তখনও পাশে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁক বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে বললেন। তাঁর কথায় —

''রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাৎলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দদাসের দু-লাইন কবিতা —

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ

চৌদিশে হিমকর; হিম করু বন্দ।

এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই বাক্সবন্দী। সেই আমার প্রথম দেশী ধরনের ছবি শুক্লাভিসার।''[২৩]

কিন্তু তবু তাঁর মন ভরে না। দেশী টেকনিক শিখতে শুরু করলেন। রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির মিস্ত্রির কাছে ছবির ফ্রেমে সোনা লাগানোর কাজ। তারপর তিনি একের পর এক দেশী টেকনিকে ছবি এঁকে চললেন। বৈষ্ণব পদাবলী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পদ্মাবতীর ছবি। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন — ''তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি? চোখ বুঝলেই ছবি আমি দেখতে পাই — তার রূপ, তার রেখা, এমনকি প্রত্যেক রঙের শেড পর্যন্ত। ... ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর, হাত লাগাতেই এক-খানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।''[২৪]

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে অবনীন্দ্রনাথ সপরিবারে এলাহাবাদে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেইখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। তিনি পত্রিকা করবেন কিন্তু ঠিকঠাক মনঃপুত নাম পাচ্ছিলেন না। অবনীন্দ্রনীথকে বলতে তিনি তাঁর পত্রিকার নাম 'প্রবাসী' রাখতে বলেন। যেহেতু তিনি প্রবাসে বাস করছেন, তাই এই নামই যথোপযুক্ত। তিনিই প্রথম অবনীন্দ্রাথের ছবি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিলেন।

শিল্পীরা সংগ্রাহক হন। অবনীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি পুরাতন ছবি ও মূর্তি সংগ্রহ করতে ভালো বাসতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে একবার মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু পুরাতন ছবি সংগ্রহ করেন। আবার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন এলাহাবাদে গিয়েছিলেন তখনও কিছু ছবি ও মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন। এভাবেই তাঁর সংগ্রহ পরবর্তী সময়ে চলতে থাকে। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন — ''এই হল বিখ্যাত টেগোর কালেক্শানের আদি উৎপত্তি। বিস্মৃত ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনে ভরা এক অতুলনীয় সম্পদে পরিণত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা। ছবি ও মূর্তিসহ গণনায় তিন হাজারটি বস্তু ছিল এই সংগ্রহে।''[২৫]

ছবি আঁকাতেই মগ্ন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ৫নং বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে সৃষ্টি করে চলেছেন একের পর এক ছবি। একদিকে বড়দা গগনেন্দ্রনাথের ছবি আঁকার টুল, মাঝে অবনীন্দ্রনাথ ও তার পাশে ভাই সমরেন্দ্রনাথ নানা বই নিয়ে পড়াশুনো চালিয়ে যেতেন। নীরবে চলত তাঁদের তিনজনের এই সারস্বত সাধনা। দক্ষিণের বারান্দা হয়ে উঠেছিল যেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির তীর্থভূমি। কবি, শিল্পী, রসিক সবাই এসে ভিড় জমাত সেই স্থানে। শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর এই দক্ষিণের বারান্দার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

''রঙটা লাল সিমেন্টের মেঝে, ফাট ধরছে মাঝে মাঝে। অতবড় সত্তর-পঁচাত্তর ফুট লম্বা, বারো তেরো ফুট চওড়া, ডবল্ ডবল্ গোল থাম, আকাশী ঝিলিমিলি ওয়ালা টানা বারান্দা, না আছে দেয়ালে একটা ছবি, না আছে একটা বর্শা, না তলোয়ার টাঙানো। ... এমন কিছুই নয়। কিন্তু তবু বল্‌ব, ঐ বারান্দাই ছিল আধুনিক ভাবশিল্পের গোমুখী। ... সমগ্র ৫নং ভবনের প্রাণ যেন স্পন্দিত হত ঐ দক্ষিণের বারান্দায়, তার সুরক্ষিত তিনটি আসনে। ... সেকালের বাংলা সমাজে এই তিন ভ্রাতার একাত্মতার ইতিহাস কমনীয় এবং কথনীয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। এই তিন জনকেই একটি শ্লোকে গেঁথে রেখে দিয়েছিলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রও। পরে আবার গানের সুর সৌন্দর্যের জন্য 'সমর' শব্দটিকে 'আঘাত' করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ —

''হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ,
হাসির সমরে আর মৌন রহেনা তার
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।''[২৬]

দক্ষিণের বারান্দায় বসে চলছিল ছবি আঁকার সাধনা। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ তাড়া দিলেন। ছোটোদের জন্য তিনি জোড়াসাঁকোতে স্কুল খুলছেন, কিন্তু পাঠ্য বাল্য গ্রন্থাবলীর খবু অভাব। উনি অবনীন্দ্রনাথকে ছেলেদের জন্য গ্রন্থ রচনা করতে বললেন। তিনি তো শুনেই থ বেনে গেলেন। তুলি দিয়ে তিনি 'ছবি লেখেন' ঠিকই, কিন্তু পুস্তক রচনা কী তাঁর দ্বারা সম্ভব। এভাবে তো তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। তিনি বললেন তাঁর দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ জোগালেন সাহস, দিলেন উৎসাহ। সে কথা তিনি স্মৃতিকথায় বলেছেন —

''একদিন আমায় উনি বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপ রে, লেখা — সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই -না; ভাষার কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে শকুন্তলা বইখানা।''[২৭]

এভাবেই রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর লেখার হাতও খুলে গেল। ছবির মতোই কলম দিয়েও তিনি সৃষ্টি করে গেলেন 'বলা গল্প'। 'শকুন্তলা'র পর একে একে লিখলেন 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভুতপত্‌রীর দেশ', 'নালক', 'খাতাঞ্চির খাতা', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি', 'মাসি' প্রভৃতি গল্প। 'আপন কথা', 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নামে স্মৃতিকথা। 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'চিত্রাঙ্কন', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

দেশীয় ভাবধারা, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধারে তিনি সদা ব্রতী ছিলেন। তাই বাংলার মাটির ঘ্রাণ, সাধারণ মানুষ, দেশজ নানান দ্রব্য তাঁর রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে। রূপকথার আমেজ পাওয়া যায় 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী'-র কোনো কোনো গল্পে। এছাড়াও অন্যান্য গল্পের নানাস্থানে রূপকথার আমেজ অনুভূত হয়। এছাড়া ছড়ার ব্যবহার, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, পুরাণ প্রসঙ্গ, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার তাঁর নানা রচনায় দেখা যায়। তিনি বাংলার লোকসংস্কৃতির বিষয় নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন — 'বাংলার ব্রত' ও 'ছেলেভোলানো ছড়া'। 'বাংলার ব্রত'-এ তিনি বিভিন্ন লৌকিক ব্রত, আলপনা ও ছড়া নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলেচনা করেছেন। আবার ছড়া সম্পর্কে নিজের নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'ছেলেভোলানা ছড়া' অংশে। আসলে রবিকার প্রেরণায় একবার যে তাঁর কলম চলতে শুরু করেছিল তা চলেছিল জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত।

তাঁর ছবি ও লেখা দুইই একে অপরের পরিপূরক। ছবিতে যেখানে মনের ভাব সম্পূর্ণ ভাবে উজাড় করে দিতে পারেন নি, তা ধরে দিয়েছেন লেখাতে। আসলে তাঁর লেখা রচনাগুলি যেন কলমে আঁকা ছবি। পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একের পর এক চিত্র। যা চোখে আরাম ও প্রাণে আনন্দ জাগায়। আসলে চিত্রকর ছিলেন বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি যখন মোগল পেন্টিং নিয়ে কাজ করেছেন, বা পড়াশুনা করছেন তখন তাঁর মধ্যে আসছে মোগল ছবির সেই রঙের বাহার, চাকচিক্য, এই সময়েরই কাছাকাছি তিনি যখন 'রাজকাহিনী' লিখেছেন, তাতে ফুটে উঠেছে ছবির পর ছবি। 'রাজকাহিনী'র বিভিন্ন গল্পে তার দেখা মেলে। 'রাজকাহিনী'র প্রথম গল্প 'শিলাদিত্য' থেকে একুট অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে —

''সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তার সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোটো পাখি কী সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে।''[২৮]

পড়তে পড়তে চোখের সামনে কথা ও ছবি একযোগে ভেসে উঠে। আবার 'নালক' যখন তিনি লিখছিলেন তার আগে বা সমসময়েই বৌদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি আঁক ছিলেন — 'সন্ন্যাসী বুদ্ধ', 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ', 'বুদ্ধের বিজয়' প্রভৃতি। তাই তুলি ছেড়ে যখন কলম ধরলেন 'নালক' রচনার সময়, সেই সময় কলম যেন তুলির কাজই করে চলল। ছোট্ট নালক তাঁর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে বুদ্ধদেবকে নিয়ে যে একের পর এক দৃশ্য দেখে চললেন, তা যেন চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের হাতে লেখা ছবি।

''রাত আসছে - বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছে, পুবে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর একপারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধি পূজোর শাঁক-ঘন্টা ভরে উঠেছে। এমন সময় মায়াদেবী রূপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগানে বেড়াতে এলেন; রাণীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রাণী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন - বাঁ হাতখানি ফুলে-ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে।''[২৯]

পড়তে পড়তে সমগ্র অংশটি ছবি হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়। শুধুমাত্র এই দুটি রচনার ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর অনেক রচনাতেই এই ছবি ও লেখার পাশাপাশি সহবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ছবি আঁকা ও লেখা সমান তালেই চলছিল। এমন সময় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ কলকাতায় মহামারীর আকার নেয়। তাঁরা চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুললেন। রবীন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরতে লাগলেন রোগের প্রকোপ বুঝতে। ভয়ে ভয়ে আছে সবাই। হঠাৎ প্লেগ থাবা বসাল অবনীন্দ্রনাথের ঘরে। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তাঁর মেয়ে। মন ভেঙে গেল তাঁর। সেই সময়ের কথা তিনি জানাচ্ছেন —

''ন-দশ বছরের মেয়েটি আমার টুক করে চলে গেল। কিছুতেই আর মান যায় না। এ বাড়ি ছেড়ে চৌরঙ্গিতে একটা বাড়িতে আমরা পালিয়ে গেলুম। সেখানে থাকি, একটা টিয়া পাখি কিনলুম, তাকে ছোলা ছাতু খাওয়াই, মেয়ের মাও খাওয়ায়। পাখিটাকে বুলি শেখাই। দুঃখ ভোলবার সাথি হল পাখির ছানাটা; নাম দিলেম তার চঞ্চু, মায়ের কোল ছাড়েনা টিয়াপাখির ছানা।''[৩০]

ছবি আঁকায় মন আর কিছুতেই বসে না। সেই সময় এগিয়ে এলেন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, অবুর মেজোমা। তিনি হ্যাভেল সাহেবের সাথে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আর্নেস্টবীনিং হ্যাভেল সাহেব তাঁকে ক্যালকাটা আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদে যোগ দিতে বললেন। প্রথমে রাজী না হলেও তাঁর জোরাজুরিতে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ চাকরিতে যোগ দিলেন। শুরু হল দশটা চারটার চাকরী জীবন। আর্ট স্কুলে গিয়ে হ্যাভেলের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন আর্ট গ্যালারি। কিছুই ছিল না প্রায় সেই গ্যালারিতে। মোগল ও পার্শিয়ান ছবি মেলে গোটা পাঁচেক ছবি সেখানে রাখা ছিল। তবে সেখানে হ্যাভেলের কাছ থেকে পাওয়া আতস কাঁচ দিয়ে একটি বক পাখির ছবি তিনি যেই দেখলেন, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। বকের প্রতিটা পালকের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ

দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। কিন্তু ছবিতে এক জিনিসের অভাব খুব তীব্র ভাবে বোধ করলেন, তা হল ভাব। তাই তিনি ভাবলেন ছবিতে ভাব দিতে হবে। বাড়িতে ফিরে এসে এঁকে ফেললেন তাঁর সেই জগৎ বিখ্যাত ছবি 'শাজাহানের মৃত্যু'। এই ছবিটি এঁকে তিনি অনেকগুলি পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। ছবিটি এত ভালো হওয়ার কারণ জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

''এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। 'শাজাহানের মৃত্যু প্রতীক্ষা'-তে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম। যখন দিল্লির দরবার হয়ে, বড়ো বড়ো ও পুরাতন আর্টিস্টদের ছবির প্রদর্শনী দেখানো হবে, হ্যাভেল সাহেব আমার এই ছবিখানা আর তাজ নির্মাণের ছবি দিলেন পাঠিয়ে দিল্লির দরবারে। আমাকে দিলে বেশ বড় একটা রুপোর মেডেল, ... তারপর যোগেশ কংগ্রেস ইণ্ড্রাস্ট্রিয়াল এক্‌জিবিশনে সেই ছবি পাঠিয়ে দিলে, সেখানে দিলে একটা সোনার মেডেল। এই রকম করে তিন-চারটে মেডেল পেয়েছি, পরিনি কোনোদিন।''[৩১]

আর্ট স্কুলের চেয়ারে প্রথম যখন অবনীন্দ্রনাথ বসেন, তখন কোনো ছাত্র ছিল না। তারপর চিত্র শিখবার তাগিদ অনুভব করে একে একে ছাত্র আসতে লাগল। সুরেন গাঙ্গুলি তাঁর প্রথম ছাত্র। তারপর একে একে এলেন সত্যেন বটব্যাল, নন্দলাল বসু প্রমুখ। এদেরকে নিয়েই চলল তার আর্টের সাধনা। এক সময় হ্যাভেলে অনুপস্থিতিতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

জাপানি শিল্পী কাকুজো ওকাকুরা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কালকাতায় এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনীথ ঠাকুরের সঙ্গে তার ছিল খুব ভাব। আর্ট সম্বন্ধে তাদের মধ্যে নানা রকম আলাপ আলোচনা হত। তিনি স্থির করেন দেশে ফিরে গিয়ে দুজন জাপানী শিল্পীকে ভারতে পাঠাবেন। তাঁরা এসে রেশমের উপর ভারতীয় বিষয় ও ভাবধারা নিয়ে ছবি আঁকবে। এতে করে তারাও যেমন কিছু শিখতে পারবে, পাশাপাশি ভারতীয় শিল্পীরাও তাঁদের কাজ দেখে সমৃদ্ধ হবে। তিনি টাইক্কান ও হিশিদা এই দুইজন শিল্পীকে ভারতে পাঠালেন। তাঁদের কাছ থেকেই ভারতীয় শিল্পীরা শিখে নেন রেশমের উপর ছবি আঁকার টেকনিক। অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলেছেন —

''টাইক্কান আমায় লাইন ড্রইং শেখাত, কী করে তুলি টানতে হয়। আমরা তাড়াতাড়ি লাইন টেনে নিই — তার কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা। আমার কাছেও সে শিখত মোগল ছবির নানান টেকনিক। এমন একটা সৌহার্দ্য ছিল আমাদের মধ্যে বিদেশী শিল্পী আর দেশী শিল্পীর মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না। এখন সেইটে বড়ো দেখতে পাইনে।''[৩২]

অবনীন্দ্রনাথ সিল্কের উপর একটি মাত্র ছবি এঁকেছিলেন - বঙ্গমাতারা ছবি। এই ছবিটি তৎকালীন সময়ে স্বদেশী মিটিং-এ ব্যবহার হত। কিছুদিন পর এই ছবিটি হারিয়ে যায়, আর তা পাওয়া যায় নি।

টাইক্কান ও হিশিদা দেশে ফিরে গিয়ে একজন শিল্পী কাটস্‌টুটা আর একজন কুস্তিগীর সানোসানকে ভারতে পাঠিয়ে ছিলেন। কাটস্‌টুটা অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারত থেকে অনেক ছবি এঁকে ছিলেন। আর সানোসান চলে যান শান্তিনিকেতনে। সেখানে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের তিনি জুজুৎসুর পাঠ দেন।

অবনীন্দ্রনাথ সব সময়ই তাঁর ছাত্রদেরকে নিয়ে ভাবতেন। কীভাবে তারা ছবিতে উন্নতি করবে, প্রচার পাবে, তাদের আর্ট সকলের সামনে উপস্থিত হবে, এ ভাবনা তার সব সময়ের। তাই ভাইদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করলেন একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখান থেকে দেশীয় ভাবধারার ছবি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, ভারতের নামও উজ্জ্বল হবে। এই ভাবনা থেকেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' এর জন্ম। ক্রমে ক্রমে সেই সোসাইট থেকে ছবি বিক্রি ও প্রদর্শনী বাড়তে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন —

''ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট নাম দিয়ে এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন হল। প্রতিষ্ঠানের কাজ হল ছবি ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনা করা, ভালো ভালো ছবি উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত করা, শিল্প বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এবং এই ভাবে উৎকৃষ্ট শিল্পের প্রচারের সাহায্যে দেশের রুচির উন্নতি ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর শোধন করা।''[৩৩]

যে কজন বিদেশী মানুষকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান ছিল সর্বাগ্রে। নিবেদিতার উপর ভরসা করতে পারতেন তিনি। তাঁর কাছ থেকেও তিনি ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে নানা জ্ঞান লাভ করেন। নিবেদিতার উৎসাহ ও উদ্যোগে তিনি নন্দলাল সহ তাঁর অন্য শিষ্যদের ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অজন্তায় ছবি নকল করতে পাঠান। প্রথমে ইচ্ছে না থাকলেও নিবেদিতার উৎসাহে ও নিপুন ব্যবস্থাপনার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। নিবেদিতা সম্পর্কে স্মৃতিকথায় বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন —

''ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালো বেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়ো। বাগবাজারে ছোট্ট ঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালো বাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন।''[৩৪]

আসলে নিবেদিতার জীবনটাই ছিল ত্যাগের। স্বামীজির বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের মানুষের কাজে হাত লাগাবেন বলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী সেই যে ভারতবর্ষের মাটিতে পা

রাখলেন, আমৃত্যু এখানেই রয়ে গেলেন। আইরিশ থেকে তিনি মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। আসলে নিবেদিতা ছিলেন ভারতবর্ষের জন্য এক নিবেদিত প্রাণ।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী ভারত ভ্রমণে এলে অবনীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পর্কে ধারণা তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। তাঁর আঁকা 'রাণী তিষ্যরক্ষিতা' ছবিটি তাঁদের খুব পছন্দ হয়। এরই কিছুদিন পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন।

আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলে পার্সি ব্রাউনকে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল করে পাঠানো হয়। মানুষটি ছিলেন ভীষণ কড়া ধরনের। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুসম্পর্ক তেমন ভাবে কখনো গড়েই ওঠেনি। এমন সময় ঘটল এক ঘটনা। সপরিবারে মুসৌরী যাবেন বলে তিনি ব্রাউনের কাছে ছুটি চেয়ে বসলেন। কিন্তু ব্রাউন তা মঞ্জুর করলেন না। এই মত কষাকষির মধ্যে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্ট স্কুলের চাকরি পরিত্যাগ করলেন। শ্রীরাণী চন্দ্র জানাচ্ছেন সে কথা —

''সেবারে মুসৌরি যাবেন, গরমকাল, বললেন, আমি আগে দরখাস্ত করেছি, আমিই যাব আগে। সাহেব বললেন, তা হবে না, আমি আগে যাব। এইরকম তক্কাতক্কি হচ্ছে। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি। অবনবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শেষে এক সময়ে গায়ের জোরে লাঠি মাটিতে ঠুকে 'এই রইল সাহেব তোমার চাকরি, কে তোমায় ডরায়।' বলে, হন্‌হন্‌ করে নেমে চলে গেলেন।''[৩৫]

সাথে সাথে তাঁর সমস্ত ছাত্ররাও তাঁর সাথে আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করে চলে এল। তাদের পাঠ দিতে লাগলেন দক্ষিণের বারান্দায়। তবে হ্যাভেলকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। গুরু বলে তাঁকে বরণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অটুট ছিল অবনীন্দ্রনাথের। তিনি লিখেছেন —

''আর্ট স্কুলের চৌকিতে বসে থাকতুম, কত দেশ বিদেশ থেকে নানারকম ব্যাপারী আসত নানারকম জিনিস নিয়ে। গবর্মেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিস সংগ্রহ করছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে যাচ্ছে। এই করে আমি চিনেছিলাম দেশের আর্ট, তার উপরে ছিল আমার হ্যাভেল-গুরু। এ দেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিল না, রোজ দু-ঘন্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি মূর্তির সৌন্দর্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। হুকুম ছিল আপিসের চাপরাসিদের উপর ওই দু-ঘন্টা কেউ যেন না এসে বিরক্ত করে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তবই কয়লা-কী ময়লা ছোটে
যব্‌ আগ্‌ করে পরবেশ।

ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারত শিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্প সৌন্দর্যের দিকে।''[৩৬]

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুব প্রাণখোলা। বাইরে থেকে গম্ভীর লাগলেও যারা তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন তারা তা বুঝেছিলেন। খুব আপন করে নিতে পারতেন সকলকে। স্নানে ছিল তাঁর খুব অনীহা। কাজ করতে করতে বেলা চলে গেলেও স্নান করার কথা তিনি ভাবতেন না। শ্রীরাণী চন্দ্র জানাচ্ছেন —

''স্নানের সময় হলেই বাবুলাল এসে তাগিদ দিতে থাকে। এই স্নান করা নিয়ে ছিল তাঁর ছোটো ছেলের মতো আপত্তি। তিনি 'এই যাই, এই যাই' করে কাজ আরো মন ঢেলে দেন। খাবার সময় উতরে যায়, বলেন, স্নান করবার দরকার নেই আজ, কেমন মেঘলা মেঘলাও করেছে, কি বলো? গরমে মরে যাচ্ছি, ঘামে গা ভেসে যাচ্ছে, শুকনো আকাশ খট্‌খট্‌ করছে। তাঁর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে হাসি সবাই।''[৩৭]

খবরের কাগজ পড়তে তিনি ভালোবাসতেন না। তাঁর অন্য ভাইরা কাগজ পড়লেও, তিনি পড়ার চেয়ে শুনতে ভালোবাসতেন বেশি। তিনি বলতেন — ''খবর কি পড়তে হয়? খবর পড়ে আরাম নেই, খবর শুনে আরাম।''[৩৮]

পুন্নবাবু বলে একজন ব্যক্তি রোজ এসে খবরের কাগজ পড়ে তাদেরকে শোনাতেন। এভাবেই ছবি আঁকতে আঁকতেই অবনীন্দ্রনাথ জেনে নিতেন দেশ তথা পৃথিবীর খবর।

ছোটোদের সাথে মিশে যেতে পারতেন খুব সহজেই। তাদেরকে দিতেন লেখার উৎসাহ। একবার তাঁর নাতি মোহনলাল তাঁকে বললেন সে গল্প লিখতে চায় কিন্তু প্লট পাচ্ছে না। তাকে সহজ উপায় বাৎলে দিলেন তিনি। স্বপ্নে যা আসে সেগুলোই সকালে লিখে ফেলতে বললেন। উৎসাহ পেয়ে তারাও লিখে ফেলল একের পর এক স্বপ্নে পাওয়া কাহিনী। যে কাগজে তারা স্বপ্ন লিখত তার নাম তিনি দিলেন 'স্বপ্নের মোড়ক'। তারপর তারা একটি পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেখানে সবাই লেখালেখি করবে। অবনীন্দ্রনাথ পত্রিকার নাম দিলেন 'দেয়ালা'। তিনি এই পত্রিকায় 'দেয়ালা' নাম দিয়ে একটি গল্পও লিখে দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি ছোটোদের উৎসাহে ও সমান ভাবে নিজেকে সামিল করতেন।

দয়ালু মনের মানুষ ছিলেন তিনি। অপরকে সাহায্য করতেন গোপনে। জানতে দিতেন না তেমন কাউকে। শ্রীরাণী চন্দ্রের লেখায় পাই —

''নন্দদার কাছে শুনেছি, নন্দদা বলতেন, কত লোককে যে উনি টাকা দিয়ে কত সাহায্য করেছেন - কত ছেলেকে মানুষ করে তুলেছেন। বাইরের লোক কেন, তাঁর আশেপাশেরও কেউ জানে না বড়ো, এসব কথা।''[৩৯]

একবার তিনি আর্ট কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাদের বাড়ির চাকর রাধুর মন খারাপ। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন রাধুর স্ত্রী মারা গেছে, তাই সে এবার বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অত টাকা নেই। শুনলেন অবনীন্দ্রনাথ। তারপ তাঁর ছবি বিক্রি থেকে পাওয়া তিনশো টাকা রাধুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তার দেশের বাড়ি বিয়ের কাজ সেরে আসতে। এমনই মনের মানুষ ছিলেন তিনি। কেমন ছিলেন দেখতে মানুষটি। যার ভেতর থেকে নানান ধরনের সৃষ্টির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তা জানতে ইচ্ছে করে আমাদের। সেই খবরটি আমরা পাচ্ছি শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের লেখা থেকে —

''শ্রীমান, এত লোক দেখছি জগতে এসে, কিন্তু এমন অদ্ভুত গড়নের আর একটি মানুষ আমি দেখিনি, আর দেখেনি এমন ধারা পায়ে হেঁটে চলা, ... শুনিনি এমন চরণ ধ্বনি। দীর্ঘ দেহের জুতোপরা দ্রুত চলা। ... যেন হেঁটে চলেছে ফল আর পাতা নিয়ে রসালদ্রুম। অন্তরিক্ষের মলিনতাকে সম্মার্জিত করে দিয়ে যেন চলেছে। এ চলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, একজনই চলেছেন অথচ মনে হচ্ছে — চলেছেন দু'জনে, গন্ধর্ব লোকের কোনো দুহিতাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, শুনেছি যাঁর নূপুরধ্বনি, অথচ দেখা পাই না তাঁর। ... অসামান্য ভ্রূ, রেখাঙ্কিত বিরাট ললাট, প্রকাণ্ড মাথা, মুখের বন্ধুরতা অতি প্রকট, বামগণ্ডে একটি প্রকাণ্ড তিল। গলায় হাতে শিরা জেগেছে, অথচ দেহের সমগ্রতায় বিরাজ করছে শিশুর মত একটি স্বচ্ছন্দ নিরভিমানতা। চরণে রাজমান বিদ্যাসাগরী চট্টরাজ।''[৪০]

ছাত্রদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সুমধুর। তাদেরকে তিনি নিজ ছেলের মতো স্নেহ করতেন। আগলে রাখতেন সমগ্র বিপদ থেকে। অজন্তার ছবি নকল করতে নন্দলাল প্রমুখদের তিনি পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতা সমস্ত সুব্যবস্থা করে দেওয়া সত্ত্বেও মন তাঁর স্থির মানছিল না। তাই যাবার পূর্বে নন্দলাল যখন তাঁকে প্রণাম করতে যান তখন নন্দকে তাঁর একটি দামি জোব্বা এবং পকেটে দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন। এমন করেই ছাত্রদের জন্য ভাবতেন তিনি।

ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটি গড়ে ওঠার পর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বছর ছবির প্রদর্শনী হত। কিন্তু ঐ প্রদর্শনীতে তিনি নিজের আঁকা ছবি খুব কম দিতেন। মেয়ে উমাদেবী এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন — ''ওরে আমার ছবি দিলে ছাত্রদের ছবি বিক্রি হবে না। তাই দিই নি।''[৪১]

এমন কথা অবনীন্দ্রনাথের মতো মানুষের মুখ দিয়েই আসে। ধ্যান ধারণা, পুজো-অর্চনাতে

কোনো দিনি তেমন ভাবে তিনি করেন নি। বাড়ির অন্যদেরকে দেখতেন এসব নিয়ে থাকতে। কিন্তু তিনি ছিলেন আলাদা। একবার লিভারের অসুখ থেকে উঠে স্ত্রীকে বললেন চৌতলার ছাদের উপর কাঠের চৌকি রেখে আসতে। প্রতিদিন সকালে তিনি সেখানে বসে ভগবানের নামধাম করেন। একদিন পুবদিকে মুখ করে চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের নাম করতে যাবেন, হঠাৎ যেন তার মনে হল কানের কাছে কেউ যেন বলছে —

'' 'চোখ বুজে কী দেখছিস, চোখ মেলে দেখ।' চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টক্ টক্ করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কী রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তার এই প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। সেদিন বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়; চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দু'চোখ মেলে তাঁকে দেখে যাব জীবন ভোর।''[৪২]

ছাত্রদেরকে শেখানোর পদ্ধতিও তার অন্যরকম ছিল। তিনি কখনো হাতে ধরে ছাত্রদেরকে শেখাতে যেতেন না। তাদেরকে উৎসাহ দিতেন, ভুল হলে ভুল শুধরে দিতেন। ওইটুকই। এর বেশি তিনি তাদের উপর মাস্টারি ফলাতেন না। তিনি আস্থা রাখতেন তাদের স্বকীয় ক্ষমতার উপর। তাদেরকে শুধু তিনি সঠিক পথ বাত্লে দিতেন। সেই পথে চলতে হত তাদের নিজেদেরকেই। স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন —

''ছবি আঁকা শিখতে কদিন লাগে? বেশি দিন না, ছ'মাস, আমি শিখিয়েছিও তাই। ছ'মাসে আমি আর্টিস্ট তৈরি করে দিয়েছি। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরই মধ্যে যাদের হবার হয়ে যায় — আর যাদের হবে না তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। ... ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টারমশায় তার ভুল ঠিক করে দেবেন কী? তুমি যেরকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? ... ছবিতেও ভুল হয় - ফেলে দিয়ে আবার নতুন ছবি আঁকো। বারে বারে একই নিয় নিয়ে আঁকো। আমি হলে তো তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে দিয়ে জোড়াতাড়া দেওয়া ও কিরকম শেখানো। দরকার হয় আর একটু নুন দিতে পারো। দরকার হয় একটু চিনি তাও দিতে পরো। কিন্তু গাছের ডালটা এমনি হবে, পাটা এমনি করে আকতে হবে, এরকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিখিয়েছি। তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।''[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। তিনি চাইতেন অবনীন্দ্রনাথও ইউরোপ সফর করুক। এতে করে তাঁর পরিচিতি বাড়বে, সে দেশের শিল্পকর্ম দেখে তাঁর উপকারেও আসবে। তাছাড়া

সেই সময় ফ্রান্স, সুইডেন, জার্মানীতে তাঁর বন্ধু, ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন —

''আমি শিল্পী, মানস চক্ষে সব দেখতে পাই ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো আর বালজাক যখন পড়েই নিয়েছি তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবে না, তুমি আমাকে বল, আমি হুবহু ল্যাটির কোয়ার্টারের ছবি এঁকে দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নীরবে একটু হাসলেন।''[৪৪]

তাজমহল তিনি কোনদিনই দেখতে যান নি। কিন্তু তিনি যখন তুলিতে তাজমহল ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা হুবহু আসলের প্রতিচ্ছবি হয়ে ধরা দিয়েছিল। এই ছিল তাঁর শিল্পের সাধনা।

মাকে খুব ভালোবাসতেন অবনীন্দ্রনাথ। আর মাতা সৌদামিনীদেবীর কাছে অবনীন্দ্রনাথ চিরদিনই সেই ছোটো 'অবু' হয়েই থেকে গিয়েছিল। একবার অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই ভাই নাটোরের মহারাজা শ্রী জগদিন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে নাটোরে গিয়েছিলেন। তারপর সেখানে হঠাৎ ভূমিকম্প হয়। একদিনের বদলে তাঁদের সেখানে রইত হল তিন দিন। অবনীন্দ্রনাথের মন আর সেখানে টিকল না। খুব চিন্তা করছেন মা যদি মরে যায়। তাই সেখান থেকে ফেরার সময় স্টেশন থেকে নেমেই সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। মাকে দেখে তবে তাঁর শান্তি। এমনই ছিল তাঁর ভালোবাসা, মায়ের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাসও ছিল খুব। একবার অবনীন্দ্রনাথ লিভারের যন্ত্রনায় কিছুদিন খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। ওষুধ চলে তুব সারতে চায় না। তারপর একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন তাঁর মা এসে পেটের সেই যন্ত্রণার জায়গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর যন্ত্রণা আর নেই, ভালো হয়ে গেছে। বাড়ির সকলে একথা শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথদের পুরীতে এক বাড়ি কেনা ছিল। নাম ছিল 'পাথারপুরী'। প্রতিবছর গরম এলেই সেখানে গিয়ে তাঁরা কিছুদিন থাকতেন। একবার সেই স্থান থেকে ফিরে আসে তাঁর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মা মারা গেলেন। মা মারা যাওয়ায় তিনি খুব ভেঙে পড়েন। তাঁর কাছে মায়ের একখানা আঁকা ভালো ছবি নেই। বেঁচে থাকায় আঁকা হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে খুব আপশোস করতেন তিনি। তার কিছুদিন পর তিনি চর্মচক্ষু দিয়ে তুলি দিয়ে কাগজে মায়ের যে ছবিখানি এঁকেছিলেন, তা দেখে সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছিল। সেই কথা আমরা অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইতে পাই —

''অবনীন্দ্রনাথের অন্তরে তাঁর মায়ের ছবি যে কত অম্লান হয়ে বিরাজ করছিল, তা তিনি নিজেও জানতেন না। মানস নেত্রের সম্মুখস্থ সেই ছবি যেদিন তিনি তুলির ডগায় কাগজের উপর ফুটিয়ে তুললেন সেদিন সবাই অবাক হয়ে গেল। যেমন অপূর্ব সুন্দর হল সেই ছবি, তেমনি আবার

হল হুবহু তাঁর মায়ের আকৃতি। মোগল পেন্টিং এর মিনিয়েচার স্টাইলের ছবি - মাঝখানে চিত্র, চারিদিক তার ইলিউমিনেটেড। ছবির নাম দিলেন 'মা'।''[৪৫]

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক 'রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক' পদ একটি। আশুতোষ ভট্টাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে ধরে বসলেন এই পদে যোগদান করতে। অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হন নি। ছবি এঁকেছেন, লেখালেখি করেছেন, কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার তো অভ্যাস নেই তাঁর। তাই গররাজি ছিলেন। শেষে আশুতোষের অনুরোধে ঐ পদে তিনি যোগ দেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ এই নয় বছরে তিনি ঊনত্রিশটি শিল্প বিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। খুব পড়াশোনা করে তিনি ঐ বক্তৃতার বিষয়গুলি তৈরী করেছিলেন। এই সমসময়েই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে নিয়েই কথা আছে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের বইতে —

'' 'সাজাহান' -এর ছবি এঁকে তিন-তিনটে মেডেল পেয়েছিলুমরে। এবার শিষ্য, ছবি না এঁকেই, হয়ে গেলুম ডাক্তার। ওধুষ-বিষুধের ডাক্তার নয়, জলের ডাক্তার, রং-এর ডাক্তার। লেক্‌চার না মারলে বুঝেছিস — আজকাল ছবির আর্টিস্ট হয় না। ছবির আমার ওরা বুঝলই না কিছু, কর্তব্যটাও বুঝল না। ... পিদ্দিমের এক ফুঁয়ে হয়ে উঠেছি এক নীলমাধব - কেয়াবত ডাক্তার।''[৪৬]

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ ঊনত্রিশটি বক্তৃতাকে একত্রিত করে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। ছবি আঁকা ও লেখা দুই চলছিল সমান ভাবে। হঠাৎ ১৯৩০ এর দিকে এসে ছবি আঁকা বন্ধ করে দেন। সকলের মতো রবীন্দ্রনাথ কেউ এই ব্যপারটা অবাক করেছিল। সেই কথা আছে স্মৃতিকথায়।

''রবিকা বললেন, 'অবন, তোমার হল কী? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?' বললুম, 'কী জান রবিকা এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি; সেইজন্যেই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন লেখার জন্য মন ব্যস্ত।''[৪৭]

সত্য সত্যই নতুন খেলা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর মন তখন ব্যস্ত ছিল। কাজের এক ঘেঁয়েমি কাটাতেও হয়তো তিনি এমন কাজ করেছিলেন। ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত প্রায় দশ বছর তিনি যাত্রাপালা রচনা করেছেন, পালায় অভিনয় করেছেন আবার কখনো 'কুটুম কাটাম' তৈরীতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি তাঁর যাত্রাপালাগুলি রচনা করেছেন। কথামালা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, রামায়ণ অবলম্বনে নিজের মনের মতো করে যাত্রার পালা বেঁধেছিলেন তিনি। আবার কখনো কখনো তিনি ছেলেদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে জোড়াসাঁকোতে

‘এসপার ওসপার’ পালার অভিনয় করিয়েছেন। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লিখেছেন ‘যাত্রাগানে রামায়ণ’, ‘খুদুর যাত্রা’ প্রভৃতি রচনা।

সেই সময় তিনি আর একটি শিল্পকর্ম নিয়ে খেলা করতেন। তা হল তাঁর কুটুম কাটাম। বাড়ির চারপাশ, বাগান ঘুরে ঘুরে তিনি এর সরঞ্জাম জোগাড় করতেন। কি ছিলনা তাতে - ভাঙা ডাল, বাকল, কাঠর টুকরো, গাছের শিকড়, তালের আঁটি, বাঁশের গোড়া ইত্যাদি। সংগ্রহ করবার পর তিনি বসতেন সেগুলিকে কোনো না কোনো মূর্তি বা দ্রব্যের রূপ দেবার। হাতের কাছেই থাকত নানান সরঞ্জাম - বাটালি, ছুরি, পেরেক, হাতুড়ি। আবার সেগুলিকে সাজানোর জন্য রাখতেন সিগারেটের খাপ, রাংতা কাগজ, রঙিন কাঁচের টুকরো, সুতো এমন নানা জিনিস। যে জিনিসগুলো আমাদের চোখেই পড়লনা, তাঁক কাছে সেগুলোই হয়ে উঠল পরম আদরের শিল্পের উপকরণ। এখানেই সাধারণের চোখের সাথে শিল্পীর চোখের তফাৎ। সেই সব উপাদন দিয়ে কখনো রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সিংহ, য়ক্ষপুরীর রঙছুট ময়ূরী প্রভৃতি। প্রায় পাঁচশো থেকে হাজারের মতো কুটুম-কাটাম তিনি গড়েছিলেন বলে শ্রীরাণী চন্দ্র জানাচ্ছেন —

‘‘কুটুম-কাটাম অনেক করে ফেলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। অনেক বিলিয়ে দিয়েও তখন প্রায় পাঁচশো কুটুম-কাটাম তাঁর কাছে ছিল। পরে তো আরো করেছেন। সব মিলিয়ে হাজারখানেক তো হবেই।’’[৪৮]

এদেরকে তিনি জড় ভাবতেন না। এরা তাঁর কাছে ছিল সব জীবন্ত। এগুলিকে তিনি বলতেন ‘বন্ধু শিল্প’, ‘প্রকৃতির ছেলে মেয়ে’। কিন্তু ছবি আঁকা ছেড়ে তিনি এসব নিয়ে কেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার কথা আমরা উমাদেবীর ‘বাবার কথা’ বইতে পাই।

‘‘শেষ জীবনে তিনি ছবি আঁকাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছেড়ে ‘গুপ্ত নিবাসে’ আসবার কিছু আগে থেকেই গাছের ডাল, এটা ওটা সেটা নানা অকাজের জিনিস দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা গড়তেন। মনটা উদাস হয়ে গিয়েছিলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায়। সেই উদাসী মনই তাঁর ঐ কাটুম-কুটুমে প্রাণ পেয়েছিল। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তাঁকে ‘বাবা, তুমি আর ছবি আঁকো না কেন?’ উদাস ভাবে বলেছিলেন, ‘মনে আর রং ধরে না তো আঁকবো কি! এখন আমার এই কাটুম-কুটুমই ভালো।’ শেষ বয়সে কাঠকাঠরাকে রূপ দিতেন।’’[৪৯]

অবীনন্দ্রনাথের এই সৃষ্টিগুলি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রাখা হয়েছিল। একবার গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এলে ঐগুলি দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। তাই দেখা হয় নি তাদের। অবনীন্দ্রসৃষ্ট কুটম-কাটাম দেখে গান্ধীজী অবনীন্দ্রনাথকে একটি

চিঠি লিখেছিলেন যেটি অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গ্রন্থে বাংলা অনুবাদে তুলে ধরেছেন।

সোদপুর,

২১/১২/৪৫

প্রিয় অবনবাবু,

গতকাল শান্তিনিকেতন থেকে পাঠানো আমার টেলিগ্রাম আশা করি আপনি পেয়েছেন। কলকাতায় এসে আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করা সম্ভব হলে আমি বড়ই আনন্দিত হতুম। কিন্তু জানি যে সে আনন্দ থেকে আমায় এখন বঞ্চিত থাকতেই হবে।

কাল সকালে আমি নন্দবাবুর মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটি কাঁচের আলমারির মধ্যে আপনার কয়েকটি অপূর্ব শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন তিনি আমায় দেখালেন। সেগুলি প্রায় কিছু না থেকেই সৃজিত। এমন কি নগন্য কাঠকুটো থেকেও আপনি যাতে ভারতকে তথা সারা জগতকে এমন জিনিস আরো দিতে পারেন তার জন্যে আপনাকে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে হবে।[৫০]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন খুব ঘটা করেই পালন করা হত। সবাই সামিল হত সেই অনুষ্ঠানে। হইচই পড়ে যেত গোটা ঠাকুর বাড়ি জুড়ে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন তখন পালন করা হত না। অনেকে এ ব্যাপারে উৎসাহী হলেও তিনি কাউকে তেমন আমল দিতেন না। শেষমেষ এদিকটায় নজর পড়ল রবীন্দ্রনাথের। তিনি অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করবার জন্য সবাইকে উদ্যোগ নিতে বললেন। কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে যখন শুনলেন অবনীন্দ্রনাথকে রাজী করানো যাইনি, তখন তাঁকে ডেকে দিনেল ধমক। তারপর তিনি আর না বলতে পারেন নি। উমাদেবীর লেখায় তার হদিস মেলে —

''রবিদার তখন অসুখ। বাবা প্রায়ই ওঁর কাছে যেতেন। একদিন রবিদা সকলকে ডেকে বললেন, 'আমার জন্মদিনটা যখন এত ঘটা করে হয়, অবনের কেন হবে না? তোমরা এবার ওর জন্মদিনটা ঘটা করে করবে। ওকি আমার চেয়ে কম? আমাদের লক্ষ্যস্থল একই, রাস্তা দুটো আলাদা।' জন্মদিনের কথা শুনে বাবা চেঁচামেচি করতে শুরু করলেন। 'না না, এ কিছুতেই হবে না। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?' রবিদা বাবকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি থামো। আমি যা বলছি তাই হবে।' শেষ পর্যন্ত বাবাকে রাজী হতে হলো।''[৫১]

সেইমতো সত্তর বছর বয়সে জন্মাষ্টমীর দিন অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হল। আসলে অবনীন্দ্রনাথ বরাবরই একটু লাজুক ছিলেন। নিজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসতেন। উমাদেবী বলেছেন — ''রবিদাদা নিজেকে ছড়াতে ভালোবাসতেন রবির মতই, কিন্তু বাবা নিজেকে ধরে রাখতে

ভালোবাসতেন।''[৫২]

কিন্তু যার উদ্যোগে এই 'জন্মজয়ন্তী' পালন সেই রবীন্দ্রনাথই তা দেখে যেতে পারেন নি। সেই বছরেই মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আস্তে আস্তে জোড়াসাঁকোর বাঁধন যেন আলগা হতে শুরু করল।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে আসা হল জোড়াসাঁকোয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু অবস্থার উন্নতি আর হল না। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ইহজগৎ এর মায়া পরিত্যাগ করে অনন্ত পথের লোকে যাত্রা করলেন। সেই সময়ের কথা মোহনলালা এর বইতে আছে।

''দাদামশায় বসেছিলেন আমাদের পাঁচ নম্বর বাড়ির উত্তরের বারান্দায় ছয় নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে। দু-বাড়ির মাঝের জমিতে অগন্য মানুষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে শেষ মুহূর্তের জন্যে। কে যেন এসে বললে, স্নান করে নিন। খেয়ে নিন। দাদামশায় এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, আমার খাওয়া হবে না এই ভাবনা তোদের? ওরে, এই বাড়িতে বসে অনেক মরা দেখেছি। অনেক শোক পেয়েছি। তোরা যা। আমি ঠিক সময় নাইব, খাব। অনেকক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠলেন। স্নান করলেন, ভাত খেলেন। খেয়ে বেতের চেয়ারে বসে পান মুখে দিতে যাবেন সেই সময় খবর এল রবি অস্ত গেছেন। পান খাওয়া হল না। তারপর এক টুকরো কাগজ আর রঙ নিয়ে এঁকে ফেললেন - অগণিত জনসমুদ্রের মাথায় রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রা।''[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, বড়দা গগনেন্দ্রনাথও দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মারা গেলেন। অবনীন্দ্রনাথ বড়ো একা হয়ে পড়লেন। জমিদারির আয় কমে গেছে। দিন দিন বাড়ছে খরচের হিসেব। এমত অবস্থায় বাড়ি বিক্রি করার একটা রব উঠল। কিন্তু মন কি যেতে যায় এই সাজানো বাগান ছেড়ে। তাই বেশকিছুদিন তিনি চেষ্টা করেছিলেন - বাড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখার, কিন্তু পারেন নি।

বেঁচে থাকাকালীনই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে চলে আসতে। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। তাঁর পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন —

''একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন - অবন, তুমি এবার শান্তিনিকেতনে চল। সেখানে বেশ আরামে থাকবে। বাবা আমার মাকে দেখিয়ে বললেন - এই বন্ধন যতদিন থাকবে, কোথাও নড়বার উপায় নেই আমার।''৫৪

তাদের মধ্যে বন্ধন সত্যি অটুটই ছিল। স্ত্রীর কথা ভেবেই তিনি কোনোদিন বিদেশেও যান নি। স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসতেন।

বাড়ি বিক্রি আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দেই বিক্রি হয়ে গেল জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ি। অবনীন্দ্রনাথ খুব আঘাত পেলেন। তাঁর সাধের দক্ষিণের বারান্দা, বাগান ছেড়ে তাকে চলে আসতে হল বি. টি. রোডের ধারে 'গুপ্ত নিবাস' নামক বাড়িতে। ছোটোভাই সমরেন্দ্রনাথও চলে গেলেন অন্য এক ভাড়া বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ নতুন বাড়িতে এসে আবার গুছিয়ে বসলেন। তাঁর স্ত্রী সুহাসিনীদেবী তখন অসুস্থ। অবনীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরে পুতুল গড়েন, আর সুহাসিনীদেবী তা তাকে সাজিয়ে রাখেন। আবার যেন অবনীন্দ্রনাথ আগের মতো করে নিজেকে খুঁজে পেলেন। পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ এর মুখেই শোনা যাক সে কথা —

''বাগানের দক্ষিণে পাঁচিলের গায়ে একটি ছোট্ট ঘর, তার দু-দিকে টিন দিয়ে ছাওয়া বারান্দা, সেইখানে আরামকেদারা আর টেবিল নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবি আঁকবার জায়গা করে নিলেন। মন একটু ভালো হওয়ায় আবার ছবি আঁকা হতে লাগল। অনেক ছবি আঁকলেন। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডস্কেপ। কুটুম-কাটামও তৈরী করতে লাগলেন সেই সঙ্গে।''[৫৫]

কিন্তু এই পুতুলখোল বেশিদিন চলল না। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন। আর রইল না তাঁর কোনো পিছুটান। শ্রাদ্ধ-শান্তির পাঠ চুকিয়ে তিনি চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে বিদেশে যেতে বললেও তিনি কখনো বিদেশে যাননি। না যাওয়ার কারণ হিসেবে আমরা একটা দিক জানতে পারি, তার স্ত্রীকে একা রেখে যাবার ভয়। বিদেশে যাননি ঠিকই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পেয়েছেন তিনি অজস্র সম্মান। তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী বিদেশের বহুস্থলে হয়েছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে, ১৯১৯ তে জাপানে তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয়। অনেকেই এসেছেন দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর সৃষ্টির কারুকার্য দেখতে। দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। একবার রদেনষ্টাইন এসেছিলেন তাঁর স্টুডিও ও আর্ট দেখার জন্য। সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয় রদেনষ্টাইনের। অলোকেন্দ্রনাথ বলেছেন — ''রবীন্দ্রনাথ ও রদেনষ্টাইননের এই পরিচয়ই হল রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার সূচনা।''[৫৬]

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকালাকে বিদেশী ভাব ও টেকনিক থেকে বের করে আনার চেষ্টা আজীবন করে গেছেন। ভারতীয় বিষয় ও টেকনিকে তিনি ছবি এঁকে গেছেন একের পর এক। কখনো কখনো নানা বিষয় থেকে তিনি ছবির উপাদান সংগ্রহ করলেও সেগুলিকে তিনি স্বকীয়তায় ও প্রতিভার স্পর্শে নবরূপ দান করেছেন। ভারতবর্ষের নাম ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর সর্বত্র। তাঁর ছবির হাত ধরেও অনেকে চিনেছেন ভারতবর্ষকে। তিনি ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তক।

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকাকালীনই অবনীন্দ্রনাথকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর অবর্তমানে যেন তিনি

শান্তিনিকেতনের ভার নেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কিছুদিন কলকাতা ও গুপ্ত নিবাস এ থেকেই তিনি আশ্রমের কাজকর্ম চালাতেন। শেষে স্ত্রী যখন মারা যান তারপর থেকে তিনি পুরোপুরি চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ এই চার বছর তিনি শান্তিনিকেতনের আচার্যদেব এর দায়ভার সামলে ছিলেন। আশ্রমের সকলেই খুশি তাদের নতুন আচার্যকে পেয়ে। তাঁরা নব উৎসাহে বরণ করে নিলেন তাঁকে। শ্রীরাণী চন্দ্রের কথায় —

''অবনীন্দ্রনাথ বেদিতে বসলেন। আশ্রমের মেয়েরা অর্ঘ্য থালা হাতে নিয়ে গীত-গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে তাক মালা-চন্দন দিলে, গান হল। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় মন্ত্রপাঠ করলেন। ... গুরুদেব বলেছিলেন, অবন, আমি যখন না থকব, তুমি এসে এদের ভার নিয়ো। তখন ভয় পেয়েছিলুম, বলেছিলুম — তা পারব না, হবে না আমার দ্বারা। তুমি না থাকলে আমি কি আসতে পারব? কিন্তু পারলুম তো - এলেম তো সেই রাস্তা ধরেই। এসেছি এখানে। এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল কিনা, তাই এমন হল।

যিনি চলে গেছেন তাঁর জন্য শোক করে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ধর্মে নিষেধ। তাই তো আমি প্রথম কথাই বলে পাঠিয়ে ছিলুম, আশ্রমের উৎসবগুলি যেন বন্ধ না হয়। উৎসব চাই। মনের উৎসব বন্ধ হলে কাজ চলবে কী করে? এ পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে। দুঃখ ভেবে কী হবে? উপর থেকে তাঁর আশীর্বাদ পড়বে। দুঃখ ভেবে না কিছু। অমৃত পরিবেশন করে গেছেন তিনি এখানে — এই ভেবে নির্ভয় হও - আনন্দে থাকো।''[৫৭]

আশ্রমে এসে তিনি যেমন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন, তেমনি আশ্রমের প্রাণেও সাড়া জেগে ছিল। ভালোই দিন কাটতে লাগল তাঁর। সকাল সকাল উঠে তিনি হাঁটতে বেরোতেন, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাদের আদরের 'অবু' দাদুর পেছনে চলত। মাঝে মাঝে গাছতলায় বসে তাদেরকে তিনি সুয়োরাণী দুয়োরাণী, রাজপুত্তরের গল্প শোনাতেন। সকলকে কাজে উৎসাহ দিয়ে চলতেন। বলতেন — ''... কাজে মন দাও, মন বসাও; কাজের মধ্যে ডুব দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে, পেয়ে যাবে মনের বল।''[৫৮]

সাথে সাথে চলত তাঁর ছবি আঁকা, রাণীচন্দ্র এসে বসতেন কাছে। আঁকা শিখতেন, শুনতেন তার মুখ থেকে নানা গল্প; আর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন তাঁর মুখের দিকে। চমকে যেতেন, কী করে একটা মানুষ এমন সুন্দর করে গল্প বলে চলে। এই গল্প শোনা থেকেই তো তিনি 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ দেখে দিয়ে ছিলেন বই দুটির পাণ্ডুলিপি। এই মহান কাজ করে রাণীচন্দ্র সেই সময়কার যুগ ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে গেছেন। নইলে ঠাকুর বাড়ি তথা সেই সময়কার অনেক কথাই অজানা রয়ে যেত। এই ভাবে চলতে চলতে তিনি একদিন অসুস্থ হয়ে

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার গুপ্ত নিবাসে ফিরে এলেন। এখানেই চলছিল তাঁর চিকিৎসা। ডাক্তার, কবিরাজ সবাই এলেন। মহাত্মা গান্ধী অসুস্থতার খবর পেয়ে পাঠালেন সচিব প্যারেলালকে গুপ্ত নিবাসে তাঁর খবর নিতে। মাঝে সমরেন্দ্রনাথ এলেন ছোটো ভাইকে দেখতে। সারাদিন দুই ভাই মেতে উঠলেন পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থনে। ফিরে গেলেন ছেলেবেলাকার দিনে।

সদ্য দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। সকলের মধ্যেই খুব হাসি-খুশি, হইচই। কিন্তু তিনি এই স্বাধীনতা নিয়ে নির্বিকার ছিলেন। অপরের মতো আনন্দে মেতে উঠেন নি। তখন প্রায় অনেকেই তাঁর সাথে দেখা করতে আসত। তেমনই একজন কেউ তাঁকে স্বাধীনতার কথা নিয়ে বললে তিনি বলে ওঠেন — ''অবনীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দিলেন - ফুঃ, স্বাধীনতা! কাকে তাড়িয়েছ? কিসের গর্ব এত? দেশ থেকে সামান্য একটা হারমোনিয়াম তাড়াতে পারলে না, তোমরা আবার স্বাধীন হলে! এখনও তোমাদের স্বাধীন হতে বহু দেরি।''[৫৯]

স্বাধীনতা সম্পর্কে এমনই ছিল তাঁর মূল্যায়ণ। শরীর ক্রমশ খারাপের দিকে চলল। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মোৎসব সমাহহের সাথেই পালন করা হল। ডাক্তার কানাই পাল নিয়মিত পরীক্ষা করে যান। কিন্তু শরীর আর সেরে উঠল না। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় চিত্রকলার নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের একটা যুগের যেন অবসান ঘটল। মৃত্যুর কিছু আগের সময়ের ঘটনা পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় ধরা আছে —

''বাড়ির সকলের, মায় ঝি-চাকরদেরও রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে বিশ্রাম নিতে গেল। আমার স্ত্রী বাবার কাছে বসে রইলেন। রাত দশটার পর বাবার চাকরের পায়ের আওয়াজ শুনলুম, বুঝলুম সে দুধ গরম করে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, তারপর আমার স্ত্রী কেঁদে উঠলেন। কান্না শুনে ছুটে গিয়ে দেখি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। গত পাঁচ বছর যে মানুষ বিছানায় আরাম করে শুতে পারে নি, বসে বসে রাত কাটিয়েছেন, তিনিই এখন পরম আরামে বিছানায় শুয়ে চির নিদ্রাগত।''[৬০]

আলম বাজার শ্মশান ঘাটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। অন্যান্য গুণীজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাই প্রশংসা করুক, তাঁর আদরের 'রবিকা' বরাবরই ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও লেখার প্রশংসা করে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানা দিক রবীন্দ্রনাথের চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল। সেই জন্য তিনি বারে বারে উৎসাহ দিয়ে চলতেন অবনীন্দ্রনাথকে। আর তার তাড়া পেয়েই অবনীন্দ্রনাথের হাত থেকে বেরিয়ে আসত নানা সৃষ্টি। সেকথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেও অনেকবার

স্বীকার করেছেন। তিনি একসময় বলেছিলেন সে কথা — ''আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।''[৬১]

রোগ শয্যায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের জন্য একটি প্রশস্তি বাক্য লিখে দিয়ে যান। যা 'ঘরোয়া'-এর ভূমিকা অংশে সংযোজিত হয়েছিল। তিনি বলেন —

''আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারে পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই জুলাই, ১৯৪১''[৬২]

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ণ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সমান প্রাসঙ্গিক। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা অবনীন্দ্ররচনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস ও বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করব।

—০—

তথ্যসূত্র

১) দেব চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির বাহির মহল, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃঃ ২২৪-২২৫।

২) অবনীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৫৯।

৩) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৭৬।

৪) আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৫৩।

৫) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

৬) তদেব, পৃঃ ১৬৮।

৭) তদেব, পৃঃ ১৭১।

৮) তদেব, পৃঃ ১৮০।

৯) তদেব, পৃঃ ২০২-২০৩।

১০) তদেব, পৃঃ ২০৩।

১১) তদেব, পৃঃ ২০১।

১২) ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১৫০।

১৩) তদেব, পৃঃ ৬৬।

১৪) তদেব, পৃঃ ৬৭।

১৫) তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০।

১৬) তদেব, পৃঃ ১৩৩।

১৭) তদেব, পৃঃ ৬১।

১৮) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৩৪।

১৯) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ১৯-২০।

২০) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৭।

২১) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ২৮।

২২) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৭।

২৩) তদেব, পৃঃ ২৭০।

২৪) তদেব, পৃঃ ২৭০-২৭১।

২৫) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ৪৩-৪৪।

২৬) ঠাকুর শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ, অবনীন্দ্র-চরিতম্, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ২১-২২।

২৭) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৫।

২৮) রাজা কাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৫৩।

২৯) নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ২৩৫।

৩০) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৭১।

৩২) তদেব, পৃঃ ২৭৩-২৭৪।

৩২) তদেব, পৃঃ ২৫২।

৩৩) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ৫০-৫১।

৩৪) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৫৪।

৩৫) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ১৩১।

৩৬) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৩০।
৩৭) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ১১০।
৩৮) গঙ্গোপাধ্যায় মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃঃ ১০৫।
৩৯) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ১১৫।
৪০) ঠাকুর শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ, অবনীন্দ্র-চরিতম্, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ২০-২১।
৪১) দেবী উমা, বাবার কথা, মিত্রালয়, ১৯৬১, পৃঃ ৩০।
৪২) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৪৮।
৪৩) তদেব, পৃঃ ২৬৪-২৬৫।
৪৪) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৬।
৪৫) তদেব, পৃঃ ৫৮-৫৯।
৪৬) ঠাকুর শ্রী প্রবোধেন্দুনাথ, অবনীন্দ্র-চরিতম্, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ৫২।
৪৭) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৯২।
৪৮) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ১২১।
৪৯) দেবী উমা, বাবার কথা, মিত্রালয়, ১৯৬১, পৃঃ ৪৬।
৫০) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ৭৪-৭৫।
৫১) দেবী উমা, বাবার কথা, মিত্রালয়, ১৯৬১, পৃঃ ৪২।
৫২) তদেব, পৃঃ ৫১।
৫৩) গঙ্গোপাধ্যায় মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।
৫৪) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকানী, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৬-৭৭।
৫৫) তদেব, পৃঃ ৮৭।
৫৬) তদেব, পৃঃ ৫৭।
৫৭) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ২৩।
৫৮) তদেব, পৃঃ ২৫।
৫৯) ঠাকুর অলোকেন্দ্রনাথ, ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃঃ ৯৩-৯৪।
৬০) তদেব, পৃঃ ৯৮।
৬১) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৬৭।
৬২) ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৩৬২।

—০—